أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৫৫। www.motaher21.net

حَيٰوةً طَيِّبَةً

" সুখী জীবন ।"

" Happy life."

সুরা: আন্-নহল

আয়াত নং :-97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে, সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো এবং (আখেরাতে) তাদের প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে।

তাফসীর :

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়্যেবা' বলতে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্থ করেছেন স্বল্পে তুষ্টি। দাহহাক বলেন, হালাল রিযক ও দুনিয়াতে ইবাদাত করার তাওফীক। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর অর্থ আখেরাতের জীবন। হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদা

বলেন, জান্নাতে যাওয়া ব্যতীত কারোই জীবন স্বাচ্ছন্দময় হতে পারে না। সঠিক কথা হচ্ছে, হায়াতে তাইয়্যেবা এসব অর্থের সবগুলোকেই শামিল করে। [ইবন কাসীর]

প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনো অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, মুমিন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দুটি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। এক- অল্পেতুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই, তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে আখেরাতে সুমহান, চিরস্থায়ী নেয়ামত পাওয়া যাবে। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্য সান্ত্বনার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শঃ আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়, তবে লোভের আতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সে ব্যক্তি অবশ্যই সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, চলনসই মত রিযক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছে তাতেই সে তুষ্ট হয়েছে। [মুসলিমঃ ১০৫৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও দো'আ করতেনঃ

"হে আল্লাহ আমাকে যা রিযক দিয়েছেন তাতে তুষ্ট করে দিন এবং তাতে আমার জন্য বরকত দিন আর আমার অনুপস্থিতিতে যে কাজ হয় তা ভালভাবে শোধ করুন।" [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৫৬]

حياة طيبة সুখী জীবন বলতে পৃথিবীর জীবন, কারণ পরকালের জীবনের কথা পরের আয়াতে বলা হয়েছে। যার সারমর্ম হল একজন চরিত্রবান মু'মিন সৎ ও ধর্মভীরু জীবন যাপনে, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও অল্পে তুষ্ট হওয়াতে যে পরম সুখ-স্বাদ অনুভব করে, তা কোন কাফের ও পাপী ব্যক্তি পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ করলেও সে সুখ-স্বাদ পায় না। বরং সে এক ধরনের মানসিক অশান্তি ভোগ করে। মহান আল্লাহ বলেন,{وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا} যে আমার স্মরণে বিমুখ হবে, তার জীবন হবে সংকুচিত।

সুরা: ত্ব-হা

আয়াত নং :-124

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِیْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اَعْمٰى

আর যে ব্যক্তি আমার “যিকির” (উপদেশমালা) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য হবে দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ করে।”

তাফসীর :

দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন হবার মানে এই নয় যে, দুনিয়ায় তাকে অভাব অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এখানে মানসিক স্থিরতা লাভ করতে পারবে না। কোটিপতি হলেও মানসিক অস্থিরতায় ভুগবে। সাত মহাদেশের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট হলেও মানসিক অস্থিরতা ও অতৃপ্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে না। তার পার্থিব সাফল্যগুলো হবে হাজারো ধরনের অবৈধ কলাকৌশল অবলম্বনের ফল। এগুলোর কারণে নিজের বিবেকসহ চারপাশের সমগ্র সামাজিক পরিবেশের প্রত্যেকটি জিনিসের সাথে তার লাগাতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকবে। যার ফলে সে কখনো মানসিক প্রশান্তি ও প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারবে না।

এখানে আদম আলাইহিস সালামের কাহিনী শেষ হয়ে যায়। এ কাহিনী যেভাবে এখানে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে আমি একথা বুঝেছি যে, (অবশ্যি আল্লাহ সঠিক জানেন) আদম আলাইহিস সালামকে শুরুতে জান্নাতে যা দেয়া হয়েছিল সেটিই ছিল যমীনের আসল খিলাফত। সে জান্নাত সম্ভবত আকাশে বা এ পৃথিবীতেই বানানো হয়েছিল। মোটকথা সেখানে আল্লাহর খলীফা তথা প্রতিনিধিকে এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে, তার খাদ্য পানীয়, পোশাক ও বাসস্থানের যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারের দায়িত্বে ছিল এবং সেবকরা (ফেরেশতাগণ) তার হুকুমের অনুগত ছিলেন।

খিলাফতের বৃহত্তর ও উন্নততর দায়িত্ব পালন করার জন্য যাতে সচেষ্ট হতে পারেন এজন্য তার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের আদৌ কোন চিন্তা তাকে করতে হতো না। কিন্তু পার্থিব যোগ্যতার অবস্থা সুস্পষ্ট হবার এবং তার দুর্বলতা ও সবলতাগুলো প্রকাশিত হবার জন্য এ পদে স্থায়ী নিযুক্তির পূর্বে তার পরীক্ষা নেয়া অপরিহার্য মনে করা হয়েছে। সে জন্যই এই পরীক্ষা হয়েছে। এর ফলে যে কথা সুস্পষ্ট হয়েছে তা এই ছিল যে, লোভ ও লালসা প্রদর্শনে প্রভাবিত হয়ে এ প্রার্থীর পা পিছলে যায়। আনুগত্যের সংকল্পের ওপর সে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। বিস্মৃতি তার জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই পরীক্ষার পর আদম ও তার সন্তারদেরকে স্থায়ী খিলাফতে নিযুক্তির পরিবর্তে পরীক্ষামূলক খিলাফত দান করা হয়েছে এবং এ পরীক্ষার জন্য একটি সময়সীমা (নির্ধারিত, সময়সীমা, কিয়ামত পর্যন্ত যার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে) নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। এই পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের জন্য জীবন ধারণের সরকারী ব্যবস্থাপনা খতম করে দেয়া হয়েছে। এখন নিজেদের জীবনোপকরণ তাদের নিজেদেরই সংগ্রহ করে নিতে হবে তবে পৃথিবী ও তার সৃষ্টিসমূহের ওপর তাদের ইখতিয়ার ও ক্ষমতা বহাল রাখা হয়েছে। এখন এরই পরীক্ষা চলছে যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা আনুগত্য করে কিনা এবং ভুল হয়ে গেলে অথবা লোভ ও লালসার প্রভাবে পা পিছলে গেলে সতর্কবাণী, স্মারক ও শিক্ষার প্রভাব গ্রহণ করে আবার সঠিক পথে ফিরে আসে কি না? এবং তাদের শেষ ফয়সালা কি

হয়, আনুগত্য না নাফরমানী? এ পরীক্ষামূলক খিলাফতের যুদ্ধে প্রত্যেকের কর্মধারার রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে এবং যে চিরন্তন জীবন ও অবিনশ্বর রাজত্বের লোভ দেখিয়ে শয়তান হযরত আদম ও হাওয়াকে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত করেছিল শেষ বিচার ও হিসেবের দিন যারা সফলকাম হবে তাদেরকে আবার সেই স্থায়ী খিলাফত দান করা হবে। সে সময় এ সমগ্র পৃথিবীটিকে জান্নাতে পরিণত করা হবে। আল্লাহর এমন সব সৎ বান্দা এর উত্তরাধিকারী হবে যারা পরীক্ষামূলক খিলাফতের আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অথবা ভুল করার পর শেষপর্যন্ত আবার আনুগত্যের দিকে ফিরে এসে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেবে। জান্নাতের এই জীবনকে যারা নিছক, পানাহার করা এ আয়েশ আরাম করে বুক ফুলিয়ে চলার জীবন মনে করে তাদের ধারণা সঠিক নয়। সেখানে অনবরত উন্নতি হতে থাকবে, অবনতির কোন ভয় থাকবে না। মানুষ সেখানে আল্লাহর খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করবে এবং এ পথে আবার কোন প্রকার ব্যর্থতার সম্মুখীন তাকে হতে হবে না। কিন্তু সেই উন্নতি ও সেসব কার্যক্রমের কল্পনা করা আমাদের জন্য ঠিক ততটাই কঠিন যেমন একটি শিশুর জন্য সে বড় হয়ে যখন বিয়ে করবে তখন দাম্পত্য জীবনের অবস্থা কেমন হবে একথা কল্পনা করা কঠিন হয়। এজন্যই কুরআনে জান্নাতের জীবনের শুধুমাত্র এমনসব তৃপ্তি ও স্বাদ-আহলাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোকে দুনিয়ার ভোগ ও স্বাদ-আহলাদের সাথে তুলনা করে সেগুলো সম্পর্কে আমরা কিছুটা আন্দাজ অনুমান করতে পারি।

এ সুযোগে আদম ও হাওয়ার কাহিনী বাইবেলে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নেয়া কম আকর্ষণীয় হবে না। বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, "খোদা পৃথিবীর মাটি দিয়ে আদমকে তৈরী করেন। তার নাসিকায় ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু প্রবেশ করান। এভাবে মানুষ জীবন লাভ করে। আর খোদা পূর্বদিকে এদিনে একটি উদ্যান নির্মাণ করান এবং সেখানে নিজের তৈরী করা মানুষকে রাখেন।" "আর উদ্যানের মাঝখানে জীবন বৃক্ষ ও ভালো ও মন্দের জ্ঞান দায়ক বৃক্ষও উৎপন্ন করেন।" "আর খোদা আদমকে হুকুম দেন এবং বলেন, তুমি উদ্যানের প্রতিটি গাছের ফল নির্দ্বিধায় খেতে পারো কিন্তু ভালো মন্দের জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল কখনো খেয়ো না। কারণ যেদিন তুমি ওর মধ্য থেকে খাবে সেদিনই মারা পড়বে।" "আর খোদা আমাদের মধ্য থেকে যে পঞ্জর বের করেছিলেন তা থেকে এক নারী সৃষ্টি করে তাদের আদমের কাছে আনেন।" "আর আদম ও তার স্ত্রী উভয়ই উলংগ ছিলেন, তাদের লজ্জাবোধ ছিল না।" আর ইশ্বরের কি নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে বেশী খল। সে ঐ নারীকে বললো ইশ্বর কি বাস্তবিকই বলেছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খেয়ো না?" "সাপ নারীকে বললো, তোমরা কোনক্রমেই মরবে না, বরং ইশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা তা খাবে, তোমাদের চোখ খুলে যাবে এবং তোমরা ইশ্বরের সদৃশ হয়ে ভালো মন্দের জ্ঞানপ্রাপ্ত হবে।" "এজন্য নারী তার ফল তার ফল পেড়ে খেয়ে ফেললেন এবং নিজের স্বামীকেও খাওয়ালেন।" "তখন তাদের উভয়ের চোখ খুলে গেলো এবং তারা বুঝতে পারলো যে, তারা উলংগ। আর তারা ডুমুর গাছের পাতা সেলাই করে নিজেদের জন্য ঘাঘরা প্রস্তুত করলেন। আর তারা সদাপ্রভু ইশ্বরের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করছিলেন। তাহাতে আদম ও তার স্ত্রী সদাপ্রভু ইশ্বরের সম্মুখ থেকে উদ্যানের বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকালেন।" তখন খোদা আদমকে ডেকে বললেন, তুমি কোথায়? তিনি বললেন, আমি উদ্যানে তোমার আওয়াজ শুনে ভীত হয়েছি এবং লুকিয়েছি, কারণ আমি উলংগ। খোদা বললেন, তুমি যে উলংগ তা তোমাকে কে বললো? যে বৃক্ষের ফল খেতে তোমাকে বারণ করেছিলাম নিশ্চয়ই তুমি তার ফল খেয়েছো। আদম বললেন, হাওয়া আমাকে তার ফল খেয়েছো। আদম বললেন, হাওয়া আমাকে তার ফল খাইয়েছে। আর হাওয়া বললো, আমাকে সাপ প্ররোচিত করেছিল। একথায় আল্লাহ সাপকে বললেন, তুমি এই কাজ করেছো, তাই গ্রাম বন্য পশুদের মধ্যে তুমি অধিক শাপগ্রস্ত;তুমি বুকে হাঁটবে এবং যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন করবে। আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তার বংশে পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি

করবো; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করবে এবং তুমি তার পাদমূল চূর্ণ করবে।" এবং নারীকে এ শাস্তি দিলেন শাস্তি দিলেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অত্যন্ত বাড়িয়ে দেবো, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে ও সে তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে।" আর আদমের ব্যাপারে এ ফয়সালা করলেন যে, যেহেতু তুমি নিজের স্ত্রীর কথা মেনে নিয়েছো এবং আমার হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করেছো, তাই তোমার জন্য ভূমি অভিশপ্ত হলো, তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে তা ভোগ করবে..... তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করবে।" তারপর সদাপ্রভু ইশ্বর আদম ও তার স্ত্রীর জন্য চামড়ার পোশাক তৈরী করে তাদেরকে তা পরালেন।" আর সদাপ্রভু ইশ্বর বললেন, দেখো মানুষ ভালোমন্দের জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আমাদের একের মতো হলো, এখন এমন যেমন না হয় যে, সে হাত বাড়িয়ে জীবন বৃক্ষের ফলও পেড়ে খায় এবং অনন্ত জীবী হয়। তাই সদাপ্রভু ইশ্বর তাকে এদনের উদ্যান থেকে বের করে দিলেন।" (আদপুস্তক ২: ৭-২৫ , ৩: ১-২৩) যারা একথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না যে, কুরআনে এ কাহিনী বনী ইসরাঈল থেকে নকল করা হয়েছে তাদের কাছে বাইবেলের এ বর্ণনা ও কুরআনের বর্ণনাকে একটু পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করার আবেদন জানাই।

এ আয়াতে মু'মিন ও কাফের উভয় দলের এমন সব সংকীর্ণচেতা ও বেসবর লোকদের ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে, যারা মনে করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার পথ অবলম্বন করলে মানুষের পরকালে সাফল্য অর্জিত হলেও তার পার্থিব জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের জবাবে আল্লাহ বলছেন, তোমাদের এ ধারণা ভুল। এ সঠিক পথ অবলম্বন করলে শুধু পরকালীন জীবনই সুগঠিত হয় না, দুনিয়াবী জীবনও সুখী সমৃদ্ধিশালী হয়। যারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার, পবিত্র-পরিচ্ছন্ন এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও সৎ তাদের পার্থিব জীবন, বেঈমান ও অসৎকর্মশীল লোকদের তুলনায় সুস্পষ্টভাবে ভাল ও উন্নত হয়। নিজেদের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কারণে তারা যে প্রকৃত সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন তা অন্যেরা লাভ করতে পারে না। যেসব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উত্তম সাফল্য তারা লাভ করে থাকেন তাও অন্যেরা লাভ করতে পারে না। কারণ অন্যদের প্রতিটি সাফল্য হয় নোংরা ও ঘৃণিত পদ্ধতি অবলম্বনের ফসল। সৎলোকেরা ছেঁড়া কাঁথায় শয়ন করেও যে মানসিক প্রশান্তি ও চিন্তার স্থৈর্য লাভ করেন তার সামান্যতম অংশও প্রাসাদবারী বেঈমান দুষ্কৃতিকারী লাভ করতে পারে না।

আখেরাতে তাদের মর্যাদা তাদের সর্বোত্তম কর্মের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত হবে। অন্য কথায় যে ব্যক্তি দুনিয়ায় ছোট বড় সব রকমের সৎকাজ করে থাকবে তাকে তার সবচেয়ে বড় সৎকাজের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চতম মর্যাদা দান করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, কোন পুরুষ বা নারী যদি ঈমানের সাথে সৎ আমল করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দুটি উপহার দেবেন একটি দুনিয়াতে অপরটি আখিরাতে। দুনিয়াতে তাকে حَيٰوةً طَيِّبَةً তথা সুখী-সুন্দর জীবন দান করবেন। অর্থাৎ দুনিয়াতে পবিত্র ও হালাল রিযিক, সুখ সম্ভোগ, মনের তৃপ্তি, ইবাদতের স্বাদ, আনুগত্যের মজা ইত্যাদি সবই দেবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে যথেষ্ট পরিমাণ রিযিক দান করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দিয়েছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছে। (তিরমিযী হা: ২৩৪৮, সহীহ)

আর আখিরাতে তাকে কাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দেবেন। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَي قَلْبِ بَشَرٍ

আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের অন্তর কল্পনাও করেনি। (সহীহ বুখারী হা: ৩২৪৪, সহীহ মুসলিম হা: ২৮২৪)

তবে কোন আমল সৎ আমল হিসেবে গণ্য হবার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে

১. একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَمَآ أُمِرُوْٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ)

"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। " (সূরা বাইয়্যেনাহ ৯৮:৫)

২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ج وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا)

“রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।”(সূরা হাশর ৫৯:৭)

সুতরাং কোন মুসলিম ব্যক্তি উক্ত শর্ত ছাড়া আমল করলে তা গ্রহণযোগ্য হবার আশা করা যায় না।

সুরা: আন্-নহল

আয়াত নং :-৯৮

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

তারপর যখন তোমরা কুরআন পড়ো তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর শরণ নিতে থাকো।

তাফসীর :

কোন কোন মুফাসসির এ আয়াত এবং এর পূর্বের আয়াতসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে বলেনঃ পূর্ববতী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই এই আয়াতে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। [দেখুন, ফাতহুল কাদীর] আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কুরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ রয়েছে। ইমাম তাবারী বলেন, সর্বসম্মত মত হচ্ছে যে, এ নির্দেশটি মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। কুরআন তেলাওয়াতের প্রথমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার কারণ হচ্ছে, যাতে শয়তান কুরআন তিলাওয়াতের সময় কোন প্রকার ঝামেলা করতে না পারে। কোন প্রকার সন্দেহে নিপতিত করতে না পারে এবং চিন্তা ও গবেষণা থেকে দূরে না রাখে। [ইবন কাসীর]

এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, মুখে শুধুমাত্র “আউযুবিল্লাহ" উচ্চারণ করলেই হয়ে যাবে। বরং এ সংগে কুরআন পড়ার সময় যথার্থই শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার বাসনা পোষণ করতে হবে এবং কার্যত তার প্ররোচনা থেকে নিস্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ্ পড়া সুন্নত নয়। [ইবনুল কাইয়্যেম: ইগাসাতুল লাহফান] সে ক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ পড়া উচিত। তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযুবিল্লাহর শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত

রয়েছে। উদাহরণতঃ কারো অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, "আউযুবিল্লাহি মিনাস শায়তানির রাজীম" পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়। [দেখুনঃ বুখারী: ৩২৮২ মুসলিম: ২৬১০]

পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িস' পাঠ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। [দেখুনঃ বুখারী: ১৪২; মুসলিম: ৩৭৫]

এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, মুখে শুধুমাত্র أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَنِ الرَّجِيمِ উচ্চারণ করলেই হয়ে যাবে। বরং এ সঙ্গে কুরআন পড়ার সময় যথার্থই শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার বাসনা পোষণ করতে হবে এবং কার্যত তার প্ররোচনা থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ভুল ও অনর্থক সন্দেহ-সংশয়ে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কুরআনের প্রত্যেকটি কথাকে তার সঠিক আলোকে দেখতে হবে এবং নিজের মনগড়া মতবাদ বা বাইর থেকে আমদানী করা চিন্তার মিশ্রণে কুরআনের শব্দাবলীর এমন অর্থ করা যাবে না যা আল্লাহর ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এই সঙ্গে মানুষের মনে এ চেতনা এবং উপলব্ধিও জাগ্রত থাকতে হবে যে, মানুষ যাতে কুরআন থেকে কোন পথনির্দেশনা লাভ করতে না পারে সে জন্যই শয়তান সবচেয়ে বেশী তৎপর থাকে। এ কারণে মানুষ যখনি এ কিতাবটির দিকে ফিরে যায় তখনি শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার এবং পথনির্দেশনা লাভ থেকে বাধা দেবার এবং তাকে ভুল চিন্তার পথে পরিচালিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। তাই এ কিতাবটি অধ্যয়ন করার সময় মানুষকে অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে যাতে শয়তানের প্ররোচনা ও সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশের কারণে সে এ হেদায়াতের উৎসটির কল্যাণকারিতা থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়। কারণ যে ব্যক্তি এখান থেকে সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারেনি সে অন্য কোথা থেকেও সৎ পথের সন্ধান পাবে না। আর যে ব্যক্তি এ কিতাব থেকে ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে দুনিয়ার অন্য কোন জিনিস তাকে বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এ আয়াতটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে এই যে, সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এমনসব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে যেগুলো মক্কার মুশরিকরা কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করতো। তাই প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ বলা হয়েছে, কুরআনকে তার যথার্থ আলোকে একমাত্র সেই ব্যক্তিই দেখতে পারে যে শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনা থেকে সজাগ-সতর্ক থাকে এবং তা থেকে নিজেকে সংরক্ষিত রাখার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চায়। অন্যথায় শয়তান কখনো সোজাসুজি কুরআন ও তার বক্তব্যসমূহ অনুধাবন করার সুযোগ মানুষকে দেয় না।

(...فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ)

এখানে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে উম্মতের সকলকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, কুরআন পাঠ করার শুরুতে

أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে শুরু করতে হবে। এটা পাঠ করা ওয়াজিব; নফল বা মুস্তাহাব নয়। সুতরাং যখনই কেউ কুরআন পাঠ করবে তখনই আউযুবিল্লাহ.....বলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে শুরু করতে হবে। এ সম্পর্কে সূরা ফাতিহার শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে শয়তান তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। বরং যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে সেই তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ)

“বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকবে না; (সূরা হিজর ১৫:৪২)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

(قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ- إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ)

“সে বলল: তোমার ইযযতের শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবই। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা তোমার একনিষ্ঠ বান্দা, তাদেরকে ছাড়া।” (সূরা স্ব-দ ৩৮:৮২-৮৩)

শয়তানের আধিপত্য বলতে বিষয়টি এমন যে, শয়তান সবধরণের মানুষের উপরই কর্তৃত্ব খাটাতে এমনকি একনিষ্ঠ মু'মিনদেরকেও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করবে। কিন্তু সাধারণ লোকদের মাধ্যমে যেভাবে সে অন্যায় কাজ করানোর ব্যাপারে সফল হবে একনিষ্ঠ মু'মিনদের বেলায় সে তা পারবে না, তাদের বেলায় সে ব্যর্থ হবে। কারণ তারা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে এবং তাঁরই আনুগত্যে ব্যস্ত থাকে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন। আমীন! (তাফসীর আযয়াউল বায়ান)

إِنَّهُۥ لَيْسَ لَهُۥ سُلْطَٰنٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই।

এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশতঃ কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। তাই বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে (কেননা, তিনিই সৎকাজের তাওফীকদাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী) এ ধরণের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। সুফিয়ান সাওরী বলেন, এর অর্থ, যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে শয়তান তাদেরকে এমন গোনাহে লিপ্ত করতে পারে না যা থেকে সে তাওবাহ করে না। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ, যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে শয়তান তাদের কাছে কোন প্রমাণ দিয়ে টিকে থাকতে পারে না। কারও কারও মতে, এ আয়াতটি অন্য আয়াত “তবে আমার মুখলিস বান্দাদের ব্যতীত” [সূরা আল-হিজর: ৪০: সূরা ছোয়াদ: ৮৩] এর অর্থের অনুরূপ। [ইবন কাসীরা] (সূরা আল-হিজরের তাফসীরে এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে।)

إِنَّمَا سُلْطَٰنُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُۥ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِۦ مُشْرِكُونَ

তার আধিপত্য তো শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে।

মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ, যারা শয়তানের অনুসরণ করে তাদেরকেই সে পথভ্রষ্ট করে। অন্যরা বলেন, এর অর্থ, যারা তাকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের উপরই তার প্রভাব কার্যকরী হয়। [ইবন কাসীর]

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আর যারা তার সাথে শরীক করে, তাদের উপরও তার ক্ষমতা কার্যকর থাকে। এর আরেক অর্থ হচ্ছে, যারা শয়তানের আনুগত্যের কারণে মুশরিক হয়েছে তাদের উপরও শয়তানের প্রভাব কার্যকর। [ইবন কাসীর]

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. যারা সৎ আমল করবে তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলকাম হবে।

২. কুরআন পাঠের পূর্বে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পাঠ করতে হবে।

৩. ঈমানদারের ওপর শয়তান প্রাধান্য লাভ করতে পারে না।

৪. কোন আমল গ্রহণযোগ্য হতে হলে তা দুটি শর্ত সাপেক্ষে হতে হবে।